কথামৃতে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির

কথামৃত এযুগের উপনিষদ। অমৃতের কথাকার শ্রীম। আজ যে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির আকর্ষণে দেশবিদেশের

প্রব্রাজিকা অশেষপ্রাণা
শ্রীসারদা মঠ

অগণিত মানুষের ঢল, তার অন্যতম প্রধান কারণ 'কথামৃত'। কথামৃতে বর্ণিত ঠাকুরের লীলার বেশিরভাগ ঘটনার স্থান এই দক্ষিণেশ্বর মন্দির। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ আর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি কখন যেন ওতপ্রোত হয়ে গেছে। বলা চলে দক্ষিণেশ্বর মন্দির আর রামকৃষ্ণদেব পরস্পর অবিচ্ছেদ্য।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে এই কালীমন্দিরের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব অপরিসীম। কথামৃতে কালীমন্দির নিজেই যেন একটি চরিত্র। শ্রীম তাঁর বর্ণনায় মন্দিরে ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন। সে-কারণে কথামৃত অনুসারে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কথা বলতে গেলে, প্রথমেই তৎকালীন মন্দির ও চারপাশ কেমন ছিল সেকথা আগে বলে নিতে হবে, তারপর দক্ষিণেশ্বরে ঘটে যাওয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কিছু লীলার প্রসঙ্গ—যা কালীমন্দিরকে পরিণত করেছে পুণ্যতীর্থে।

কথামৃত পড়লে মনে হয় এক চিত্রশিল্পী ক্যানভাসে একের পর এক ছবি এঁকে চলেছেন। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের আগে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা টেনেছেন, সেই ভাবটি ধরে সমগ্র পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

কথামৃতে এই মন্দির কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা প্রতিভাত হয়েছে 'দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' এই শিরোনামের মধ্য দিয়ে। কথামৃতের প্রথম পরিচ্ছেদ শুরুই হয়েছে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে কালীবাড়ির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে : ''শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি মধ্যে—চাঁদনি ও দ্বাদশ শিব মন্দির—পাকা উঠান ও বিষ্ণুঘর—শ্রীশ্রীভবতারিণী মা-কালী—নাটমন্দির—ভাঁড়ার, ভোগঘর, অতিথিশালা ও বলিদানের স্থান—দপ্তরখানা—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর—নহবত, বকুলতলা ও পঞ্চবটী—ঝাউতলা, বেলতলা ও কুঠি—বাসনমাজার ঘাট, গাজীতলা, সদর ফটক ও খিড়কি ফটক—হাঁসপুকুর, আস্তাবল, গোশালা ও

পুষ্পোদ্যান—শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বারান্দা—আনন্দনিকেতন।" এই আনন্দনিকেতনে ঠাকুর যে ভক্তসঙ্গে কত আনন্দলীলা করে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। স্বল্প পরিসরে মাস্টারমশাইকে অনুসরণ করে আমরা তারই কয়েকটি উল্লেখ করার চেষ্টা করছি।

মাস্টারমশাই আমাদের পথপ্রদর্শক। তিনি নিয়ে চলেছেন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির অভিমুখে, অবতারপুরুষের লীলাক্ষেত্রে। কলকাতা থেকে আড়াই ক্রোশ উত্তরে এই কালীবাড়ি। সেইসময় সবচেয়ে সহজ রাস্তা ছিল নৌকা করে এসে কালীবাড়ির ঘাটে পৌঁছনো। নৌকা থেকে নেমে সুবিস্তীর্ণ সোপান দিয়ে পূর্বমুখে কালীবাড়িতে প্রবেশ করতে হত। এই ঘাটে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্নান করতেন। সোপানের পরেই চাঁদনি। চাঁদনির উত্তরে ছয়টি, দক্ষিণে ছয়টি মোট বারোটি শিবমন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে ভাবাবিষ্ট হয়ে শিবমন্দিরের সিঁড়িতে বসে থাকতেন। নৌকার যাত্রীরা দূর থেকে বলতেন, ''ওই রাসমণির ঠাকুরবাড়ি।" ধন্য রানি রাসমণি! তোমারই সুকৃতিতে এই দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই সচল প্রতিমা—এই মহাপুরুষকে কত সাধারণ মানুষ দর্শন ও পুজো করছে।

কালীবাড়ির পূর্ব অংশে রাধাকান্তের বৃহৎ মন্দির ও মা ভবতারিণীর মন্দির। রাধাকান্তের মন্দিরে রাধাকৃষ্ণবিগ্রহ। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে (১৮৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দে) এই মন্দিরে পূজারি হয়ে আসেন। একবার এখানে শ্রীকৃষ্ণের পা ভেঙে গেলে নতুন মূর্তি আনার কথায় তিনি অসাধারণ নৈপুণ্যে শ্রীমূর্তির চরণটি জোড়া দিয়ে বলেন, ''জামাইয়ের পা ভেঙে গেলে তোমরা কি নতুন জামাই আনবে?"

এরপর মূল মন্দির। মায়ের নাম শ্রীভবতারিণী। খাতায়-কলমে 'জগদীশ্বরী কালীমাতা'। কিন্তু তিনি ভবতারিণী কালী নামেই প্রসিদ্ধ। মাস্টারমশাই মায়ের এমন বর্ণনা দিয়েছেন যে চোখের সামনে মাতৃমূর্তি জীবন্ত হয়ে ওঠে। ''শ্বেতকৃষ্ণমর্মর-প্রস্তরাবৃত মন্দিরতল ও সোপানযুক্ত উচ্চবেদী। বেদীর উপরে রৌপ্যময় সহস্রদল পদ্ম, তাহার উপর শিব, শব হইয়া দক্ষিণদিকে মস্তক—উত্তরদিকে পা করিয়া পড়িয়া আছেন। শিবের প্রতিকৃতি শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত। তাঁহার হৃদয়োপরি বারাণসী-চেলিপরিহিতা নানাভরণালঙ্কৃতা এই সুন্দর ত্রিনয়নী শ্যামাকালীর প্রস্তরময়ী মূর্তি।" সাধারণত আমরা দেখি মা কালীর আলুলায়িত কেশ। কিন্তু এখানে তাঁর কেশদাম খোঁপা বাঁধা। পাদপদ্মে নূপুর, পাঁজেব, চুটকি, বিল্বপত্র। রামকৃষ্ণদেবের পছন্দ ছিল বলে পশ্চিমের মেয়েদের মতো তিনি মাকে পাঁজেব পরিয়েছেন। ''ত্রিনয়নীর বাম হস্তদ্বয়ে নৃমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরাভয়।" দেওয়ালের এক পাশে চামর ঝুলছে। সেই চামরে শ্রীরামকৃষ্ণ কতবারই না ব্যজন করেছেন!

অপূর্ব ছবি! চোখের সামনে যেন চলচ্চিত্র দেখা যাচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে প্রস্তরময়ীকে চিন্ময়ী করে তুলেছিলেন। মন্দিরশীর্ষ নবরত্নমণ্ডিত, নিচে চারটি চূড়া, মধ্যে চারটি চূড়া ও সর্বোপরি একটি। মন্দিরগাত্রের কারুকার্য খাঁজ কাটা-কাটা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মাকে হৃদয়ে ধারণ করেছে বলে মন্দিরের গা থেকে আনন্দ উপচে পড়ছে।

কালীমন্দিরের সামনে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে বিশাল নাটমন্দির। নাটমন্দিরের উপর শ্রীশ্রীমহাদেবের ধ্যানস্থ মূর্তি। ঠাকুর এই মহাদেবকে প্রণাম করে মন্দিরে ঢুকতেন, যাতে তিনিও সম্পূর্ণ মন দিয়ে নিশ্চল হয়ে পূজা করতে পারেন। এই নাটমন্দিরেই বৈষ্ণব পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ, গৌরী পণ্ডিতদের মতো বড় বড় পণ্ডিতদের নিয়ে বড় সভা হয়েছিল, যেখানে সর্বসমক্ষে ভৈরবী ব্রাহ্মণী প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে ঠাকুর সাধারণ মহাপুরুষ নন, তিনি 'অবতার'। ভক্তদের কৃপা করতে স্বয়ং ভগবান অবতরণ করেছেন ধরণীর ধূলিতে।

দ্বাদশ শিবমন্দিরের উত্তরের ঘরটিতে থাকতেন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। ঘরের পশ্চিমদিকে অর্ধমণ্ডলাকার একটি বারান্দা। সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি গঙ্গাদর্শন করতেন। তাঁর ঘরের পূর্বদিকের বারান্দায় তিনি ভক্তসঙ্গে বসে ধর্মপ্রসঙ্গ করতেন, সংকীর্তন করতেন। এই বারান্দাতেই ভক্তেরা তাঁর জন্মোৎসবও করেছেন। পশ্চিমের বারান্দার পরই পথ, তারপর ফুলের বাগান ও পোস্তা। পোস্তার পশ্চিম গায়ে পূতসলিলা গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হয়ে বইছেন, সাগরে মিলিত হওয়ার জন্য কত ব্যস্ত! পথে একবার মহাপুরুষ আর মন্দির দর্শন স্পর্শন করে যাচ্ছেন।

ঠাকুরের ঘর থেকে বেরিয়ে উত্তরে বাগান, তারপরে নহবতখানা। নহবতের নিচের ঘরে ঠাকুরের জননী ও পরে শ্রীশ্রীমা থাকতেন। নহবতের পরে বকুলতলা ও ঘাট। আরও উত্তরে পঞ্চবটী—ঠাকুরের সাধনস্থল। এখানে বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি পাঁচটি গাছ ঠাকুর রোপণ করেছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে এখানে সেখানকার ধূলি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখানে কতই না সাধন হয়েছে! কত সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা এসেছেন! আরও উত্তরে খানিকটা গিয়ে লোহার তারের রেল, তার ওপারে ঝাউতলা। ঝাউতলার পূর্বদিকে বেলতলা। এখানেও পরমহংসদেব অনেক কঠিন সাধনা করেছিলেন, বিশেষত তন্ত্রসাধনা।

উঠোনের দেউড়ি থেকে উত্তরমুখে দোতলা কুঠি। ঠাকুরবাড়িতে এলে রানি রাসমণি, তাঁর জামাই মথুরবাবু প্রমুখ এখানে থাকতেন। তাঁদের জীবদ্দশায় এই কুঠিবাড়ির নিচের পশ্চিমের একটি ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ থাকতেন। এখানে ঠাকুরের জননী চন্দ্রমণি দেবী আর ভাইপো অক্ষয় দীর্ঘদিন বাস করেছেন। ষোলো বছর কুঠিবাড়িতে ও চোদ্দো বছর পূর্বোক্ত ঘরে—মোট দীর্ঘ ত্রিশ বছর যুগাবতার এই মন্দিরে বাস করেছেন।

মা কালীর মন্দিরের পূর্বদিকে একটি পুকুর। এই পুকুরের একটি বাসন মাজার ঘাট ও পথের সামান্য দূরে আর একটি ঘাট আছে। ওই ঘাটের কাছে একটি গাছ আছে, তাকে গাজীতলা বলে। তাছাড়াও রয়েছে হাঁসপুকুর, আস্তাবল, গোশালা, ফুলের বাগান। ফুলের বাগান থেকে ঠাকুর ফুল তুলতেন। ''একদিন পুষ্পচয়ন করিবার জন্য বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় কে যেন দপ্ করিয়া দেখাইয়া দিল যে, কুসুমিত বৃক্ষগুলি যেন এক-একটি ফুলের তোড়া, এই বিরাট শিবমূর্তির উপর শোভা পাইতেছে—যেন তাঁহারই অহর্নিশ পূজা হইতেছে। সেইদিন হইতে আর ফুল তোলা হইল না।''

শ্রীম বলেছেন, কালীবাড়ি 'আনন্দনিকেতন' হয়েছে। একদিকে ভাগীরথীর বহুদূর পর্যন্ত পবিত্র দর্শন, আবার নানা বর্ণ ও গন্ধের ফুলে সাজানো প্রসারিত উদ্যান। তাতে আবার একজন চেতন মানুষ অহর্নিশ ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে আছেন।

এই মন্দিরে কত ভজন-কীর্তন হয়েছে, সারা পৃথিবী আজ তার কথা জানে। মন্দির সাধনার স্থান।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি শুধু যুগাবতারের সাধনায় ধন্য তা নয়, তাঁর প্রভাবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের বহু সাধু এখানে সাধনা করেছেন, আজও করছেন। যুগাবতারের সাধনার দুটি দিক অল্প কথায় তুলে ধরতে চাই—ঈশ্বরমুখী ও মানবমুখী।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন মা ভবতারিণীর পুজো করলেন তখন মাকে পাওয়ার জন্য তীব্র ব্যাকুলতায় অস্থির হয়ে উঠলেন। মার দর্শন না পেলে এ-জীবনই আর রাখব না—এই মনে করে মন্দিরের দেওয়ালে রাখা খাঁড়ার দিকে হাত বাড়িয়েছেন, তখনই দর্শন পেয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। ''ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই!... এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্র!'' তাঁর নিজের কথায়—''মা দেখিয়ে দিলেন যে মা-ই সব হয়েছেন। দেখিয়ে দিলেন সব চিন্ময়! প্রতিমা

চিন্ময় বেদী চিন্ময়!—কোশাকুশি চিন্ময়, চৌকাঠ চিন্ময়।" তিনি নিজেও চিন্ময়, চেতন আর জড়র কোনও ভেদ নেই। ঠাকুর যে শুধু নিজে দেখেছেন তা নয়, নরেনকেও দেখিয়েছেন। ঠাকুর একদিন নরেনকে স্পর্শ করে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। নরেন্দ্রনাথ দর্শন করলেন ঈশ্বর ভিন্ন জগতে আর কিছুই নেই। দেখছেন অন্ন, থালা, পরিবেশনকারী, তিনি নিজেও ঈশ্বর ভিন্ন কিছু নয়। বেদান্ত না বলে একে বিজ্ঞান বললেও ভুল হয় না, কারণ সবই সেই একই শক্তির রূপভেদ। স্বামীজীর সঙ্গে আমেরিকায় দেখা হয়েছিল বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিকোলা টেসলার। কিন্তু টেসলা তখনও এ-বিষয়ে কিছু গবেষণা বা আবিষ্কার করে উঠতে পারেননি। তখনও তো আবিষ্কৃত হয়নি $e=mc^2$। স্বামীজী টেসলার কাছে জানতে চেয়েছিলেন বিজ্ঞান ও বেদান্ত এক করে দেওয়া যায় কী না। সেই মুহূর্তে টেসলা তাঁকে সাহায্য করতে সক্ষম হননি। অথচ তার কত আগে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন—জড়-চৈতন্য অভেদ। শ্রীরামকৃষ্ণের গবেষণাগারে আর-এক বিস্ময়কর ফলাফল—'যত মত তত পথ'। এক মতের সঙ্গে আর-এক মতের কোনও দ্বন্দ্ব নেই, ভেদ নেই। ঠাকুর ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছ থেকে তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ হলেন, রামায়েত সাধু জটাধারীর কাছ থেকে রামলালাকে পেয়ে বাৎসল্যভাব এবং পরে মধুর ভাবের সাধনা করলেন। শেষে তোতাপুরীর কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করলেন। ইসলাম ধর্মেও সাধন করে সিদ্ধ হন তিনি। দেবমানব যিশুখ্রিস্ট শ্রীরামকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে তাঁর শরীরে লীন হয়ে যান। শুধু তত্ত্ব নয়, সাধনা করে রামকৃষ্ণদেব হাতে-কলমে করে দেখালেন সব মতই সত্য। এক ঈশ্বর তাঁর নানা রূপ। ধর্ম নিয়ে যত বিদ্বেষ, যত উন্মাদনা, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বসে সবের সমাধান করে দিলেন যুগাবতার।

মানুষকে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবার তাঁর মানবমুখী সাধনা। কুঠিবাড়ির ছাদে উঠে ব্যাকুলভাবে ডাকলেন—ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়। শুদ্ধসত্ত্ব আধার না পেলে কেমন করে তাঁর ওই সম্পত্তি বিলোবেন? একে একে আসতে লাগলেন লাটু, রাখাল, নরেন, বাবুরাম, নিরঞ্জন, কালীপ্রসাদ...। তিনি গড়ার কাজ শুরু করলেন। কাঁচা মাটিকে যেমন আকার দেবেন, তেমনটি হবে। এঁদের দিয়ে জগতকে নতুন আদর্শ শিখিয়ে গেলেন—শিবজ্ঞানে জীবসেবা ও মাতৃভাব প্রচার।

শুষ্ক কঠোর নির্মম বলে প্রসিদ্ধ বেদান্তকে জ্ঞান-ভক্তির সঙ্গে মিশিয়ে মধুর সরস আলোক দেখালেন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শে। অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করতে হলে সংসার ছেড়ে চলে যেতে হবে না, লোকবর্জন করে গুহায় তপস্যা করতেও হবে না। শুধু জপধ্যান করেই নয়, সেবা করেও মুক্তিলাভ করা যায়। এভাবেই দক্ষিণেশ্বর থেকে উৎসারিত এই বাণী আজ উপনিষদের নববাণী বা এযুগের মহাবাক্য হয়ে গেল।

মাতৃসাধনা করে, স্ত্রীগুরু গ্রহণ করে এবং সহধর্মিণীকে দেবীজ্ঞানে পূজা করে নারীশক্তি জাগরণের ইতিহাসে মাতৃভাবের সূচনা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সকলের জন্য রেখে গেলেন শ্রীমা সারদা দেবীকে, যিনি তাঁর বিশ্বপ্রেম ধারণের পাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া যেমন বৃন্দাবন হয় না, শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া তেমন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরকে ভাবা যায় না। সারা পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ এই আনন্দধাম দর্শন করতে ছুটে আসছেন আনন্দের অংশ লাভ করতে। আজও ঠাকুর ডাকছেন, ''ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়।''